মমতাময়ী

মা দিবস ২০১০ উপলক্ষে সামহয়ারইন ব্লগের ব্লগারদের লেখা নিয়ে প্রকাশিত ই-বুক

মমতাময়ী

মা দিবস ২০১০ উপলক্ষে
সামহয়ারইন ব্লগের ব্লগারবৃন্দের লেখা সঙ্কলন

প্রকাশকালঃ ৯ই মে ২০১০

গ্রাফিক্সঃ ~স্বপ্নজয়~
সংকলনে ব্যাবহৃত সকল ছবি ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে

সম্পাদনাঃ kisuna এবং বাবুনি সুপ্তি

কৃতজ্ঞতাঃ সামহয়ারইন ব্লগের সকল ব্লগার

© 2010 somowhereinblog.net

সূচীপত্র

মা... ০৫
ডলুপুত্র
মা... ০৬
শামীম শরীফ সুষম
মা বিহীন দিনগুলো ৮
কষ্ট শিকারি
মা ১০
মিনহাজ চৌধুরী
বই বনাম বই আর মায়ের হাতে মার খাওয়ার স্মৃতি ১১
মনচলি
আম্মুসোনা ১৪
আকাশনীল
আমার তুলতুলে একটা অভিমানী "মা" ১৬
শ্রাবনসন্ধ্যা
যে কথা মাকে বলিনি... ২০
মতিউর রহমান সাগর
যে চিঠি কখনো পৌছুবে না ২২
ইলা মুৎসুদ্দী
মাতৃত্ব ও স্বার্থপরতা ২৪
বাবুল হোসেইন
প্রাপক, আমার মা ২৫
অগ্নিলা
আম্মার কথা ২৫
অদিতি

শিরোনামের ওপর ক্লিক করে সরাসরি লেখায় যেতে পারবেন। প্রতি পাতার নীচে ডান দিকে, ঘরের ছবিতে ক্লিক করে সূচিপত্রে ফেরত আসা যাবে।
লেখার ওপর লেখকের নামে ক্লিক করলে লেখকের ব্লগে যাওয়া যাবে।

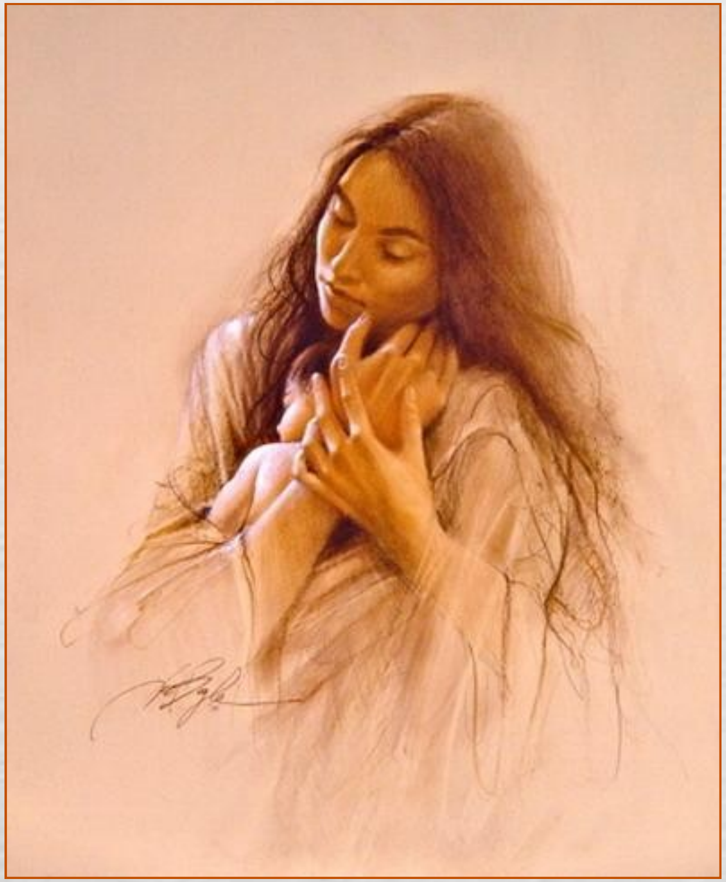

মধুর আমার মায়ের হাসি
চাঁদের মুখে ঝরে
মাকে মনে পড়ে আমার
মাকে মনে পড়ে।

তার মায়ায় ভরা সজল দিঠি
সেকি কভু হারায়,
সে যে জড়িয়ে আছে ছড়িয়ে আছে
সন্ধ্যা রাতের তারায়,
সেই যে আমার মা
বিশ্বভূবন মাঝে তাহার নেইকো তুলনা।

তার ললাটের সিঁদুর নিয়ে
ভোরের রবি উঠে
আলতা পড়া পায়ের ছোঁয়ায়
রক্ত কমল ফোটে।

প্রদীপ হয়ে মোর শিয়রে
কে জেগে রয় দুঃখের ঘরে
সেই যে আমার মা
বিশ্বভূবন মাঝে তাহার নেইকো তুলনা।

মধুর আমার মায়ের হাসি
চাঁদের মুখে ঝরে
মাকে মনে পড়ে আমার
মাকে মনে পড়ে।

মা...

ডলুপূত্র

আমার মায়ের মতো পৃথিবীর সবকটি মুখ
ঝুলে আছে মাঠ পারে পুষ্পময় কদমের গাছে
আর তাকে ব্যঙ্গ করে শৈশবের সুতো কাটা ঘুড়ি।

আবারো কার্তিক আসে চারিদিকে রাঢের দাপট
পুষ্ঠস্তন ভারে নুয়ে পড়া সেই মাকে মনে পড়ে
আমার মায়ের মত পৃথিবীর সবকটি মুখ।

নিঃস্ব গলির মোড়ে উৎসুক মায়েদের চোখে
অমাবশ্যা লেগে আছে এই গ্রহে চাঁদ জ্বলেনি
তাই রাত জেগে থাকি, মা-র অনন্ত তৃষা মিটুক।

গহীন জলের কাঙ্খা মায়েদের মুখ মনে আনে
দীর্ঘ সাতার থেকে ডানহীন কৌতুহলী মাছ
লৌলিক বিচ্যুতি দেখে ক্রমাগত সমুদ্রের ঘ্রাণে।

মা...

শামীম শরীফ সুষম

মা ,

আমি জানি , আমার জন্য
থালায় ভাত সাজিয়ে আজ অপেক্ষা করবার মত কেউ নেই ।
আমি জানি , আমার জ্বর হলে ,
আমার পাশে আমি কখনোই পাবোনা খুঁজে একজোড়া অশ্রুসিক্ত চোখ ।
আমি জানি , আমার সব সাফল্যকে , সকল প্রাপ্তিকে ,
সকল দুঃখকে , সকল কান্নাকে ,
অসংখ্য হাতে জড়িয়ে নিজের বুকে তুলে নেবে -
এমন কেউ আজ এই পৃথিবীতে নেই ।

আমি জানি , ১১ই রমযানের সেই মধ্যাহ্নের পর থেকে ,
আমি বড় একা হয়ে গেছি ।
আমার সব কষ্ট এখন আমাকে একাই বইতে হবে ,
সবটুকু পথ চলতে হবে একা ,
আমি জানি আজ আমার চুল আঁচড়ে দেবার মত কেউ নেই ,
কেউ নেই আমাকে তোমার মত ভালোবাসবে ।

মা ,

আজ মা দিবস ,
আমি তোমাকে নিয়ে একটি কবিতা লিখতে চেয়েছিলাম ।
বুকের অতল সমুদ্রে আমি কোন অক্ষর পাচ্ছিনা ,
আমার হাতে শুধু কিছু বিনিদ্র , রক্তাক্ত প্রহর ,
আমার অশ্রুজলে ভিজে যাচ্ছে প্রিয় কবিতার খাতা -
আমি কিছুই লিখতে পারছিনা, মা ।

আমি জানিনা, পরকাল বলে কিছু আছে কি নেই,
আমি জানিনা কেমন আছো তুমি আমায় ফেলে -

আমি ভালো নেই, মা।

============================

এটি আমার লেখা একমাত্র কবিতা, যা লিখতে গিয়ে কান্নার জন্য আমি লিখতে পারিনি কিছুই। আমার মা মারা যান ২০০১ সালে, ক্যান্সারে)

মা বিহীন দিনগুলো

কষ্ট শিকারি

সময়টা ১৯৯৩ সাল এর দিকে। ক্লাস থ্রির বার্ষিক পরিক্ষা শেষ; ফোরে উঠলাম। ক্লাস ও শুরু হয়ে গেছে। ঠিক তখনি সিদ্ধান্ত হল যে আমাকে উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যেতে হবে, মানে গ্রাম থেকে ঢাকাতে চাচার বাসায় থেকে পড়াশোনা করতে হবে। এই খবর পাওয়ার পরে খুশিতে লাফাচ্ছি। ঢাকা যাব পড়তে; ভাবতে ভালই লাগছিল। মাথায় আর কোন ভাবনার উদয় হচ্ছিল না। যথা সময়ে চাচার সাথে ঢাকা রওনা দিলাম। লঞ্চে করে ঢাকা যাচ্ছি অনেক ভাল লাগছে। রাতে ঘুমালাম। ভোরে যখন ঘুম ভাঙল তখন ইতোমধ্যে ঢাকা চলে আসছি।

তখনি মনের মধ্যে একটা হাহাকার বোধ করলাম। কারন আজ ঘুম থেকে উঠে আমার মায়ের মুখ দেখা হয়নি। মিরপুরে চাচার বাসায় আসলাম। শুরু হল আমার শহুরে জীবন। বাসার পাশে একটা স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হল। ক্লাস এ যেতে শুরু করলাম। কিন্তু জীবনে ছন্দ খুজে পাচ্ছিলাম না। মায়ের কথা খুব মনে পরত। আর সারক্ষন কান্না পেত। আমার এক একটা দিন মনে হতে লাগল এক একটা বছরের মত। ক্লাসে যেয়ে পিছনে বসে থাকতাম। মন বসত না। মনে হত ক্লাস আর শেষ হয় না। বিকালে স্কুল থেকে এসে কোন কাজ পেতাম না। বারান্দায় যেয়ে গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে থাকতাম, রাস্তার মানুষ দেখতাম। বিকেলগুলো যে এতটা বিষন্ন হতে পারে আমার জানা ছিল না। মাকে ভুলতে পারছিনা এক মুহুর্তের জন্য। সব সময় গলার কাছটাতে কান্না উঠে এসে দলা পাকিয়ে থাকত। সন্ধ্যা ফুরায়; রাত আসে। রাতের খাবারের পরে ঘুমাতে যায় সবাই, আমিও যাই। সবাই ঘুমিয়ে পরে। আর আমার কান্না শুরু হয়। আমার মনে হয় এই পৃথিবীতে আমার আপন কেউ নাই। আমি বড় একা। আমি কেমন ঘোরের মধ্যে চলে যাই। সিলিং এর সাথে ফ্যান ঘুরছে। বারান্দা থেকে দরজা হয়ে ল্যাম্পপোস্ট এর আলো পরত অর্ধেকটা ফ্যান এ। অশরিরী লাগত ব্যাপারটা আমার কাছে। মনে হত আমার এই কষ্টের জীবনটা ওই চলমান ফ্যানের মতই চলতে থাকবে। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় ঘুমিয়ে পরতাম। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে পড়ে যেত আমার মা আমার কাছে নাই। এখন কেউ বলেনা আব্বু উঠো, সকাল হয়ে গেছে। বুকটা ভেঙে কান্না আসত। কান্না চেপে রাখতে পারতাম না। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতাম পেটে ব্যাথা করতেছে। আজও অনেকেই জানেনা আমার সেই কান্নার কারণ। প্রত্যেকটা দিন আমার একইভাবে কাটতে লাগলো।

মায়ের কাছে চিঠি লিখতাম, মাসে তিন চারটা। কি লিখব বুঝতে পারতাম না। কষ্টের কথাগুলো লিখতে পারতাম না চিঠিতে। ভাবতাম আমার কষ্টের কথা শুনে মা যদি আমার জন্য কান্না করে। মায়ের কান্না ভেজা চোখ আমি কল্পনা করতে পারতাম না। মা যখন আমাকে চিঠি লিখত আমি তার মধ্যে মায়ের স্নেহের গন্ধ খুঁজে বেড়াতাম।

একবার টাইফয়েড হল। গায়ে প্রচন্ড জ্বর। একশ পাঁচ একশ ছয় পর্যন্ত উঠে যায় জ্বর। সারাক্ষণ পাশে মাকে খুঁজে বেড়াই। মায়ের হাতের একটু ছোঁয়া কপালে পেতে খুব ইচ্ছা করে। মা একটু হাত বুলিয়ে দিলেই আমি ভাল হয়ে যাব। মনে হচ্ছিল আমি আর বাঁচবো না। আমি মরে গেলে মা অনেক কাঁদবে ভেবে আমার কান্না পাচ্ছিল। আবার মায়ের উপর অনেক অভিমান হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমার মা নেই। এই পৃথিবীতে যার মা নাই আমি তার কষ্টটা অনুভব করতে পারছিলাম।

একসময় জ্বর ভাল হল। কিন্তু আমার সময় আগের মতই কাটছে। পড়ালেখায় মন নাই। রেজাল্ট ভাল হচ্ছে না। এভাবে দীর্ঘ এক বছর কাটল। যেখানে আমার একটা দিন ছিলনা যেদিন আমি কাঁদি নাই। একদিন আমার সব কান্না শেষ হল। আমাকে আবার বাড়িতে নিয়া আসা হল। কারণ যেই পড়াশোনার উন্নতির জন্য আমাকে ঢাকা পাঠান হয়েছিল আমি তা করতে ব্যার্থ হয়েছি।

এর পড়ে দশটি বছর কেটে গেছে। আমি ইন্টার এ পড়ছি। কোন একদিন কি যেন একটা কাজে মায়ের আলমিরা খুলে খোঁজাখুঁজি করছিলাম। হঠাৎ কিছু চিঠি পেলাম। পড়ে দেখি এগুলো মায়ের কাছে আমার লেখা সেই চিঠিগুলো। মা আজও যা স্বযত্নে রেখে দিয়েছেন। মা আমি চাইনা আমার কারনে তোমার চোখে জল আসুক। তোমায় অনেক ভালবাসি মা।

মা

মিনহাজ চৌধুরী

রোদেলা দুপুর ,দুরাশার ভেরি
নৈরাশ চিতকার
ক্রন্দিত শিশুকে পরম আদরে আগলে রাখেন যিনি ,
মা যে নাম তার ।

যে রিদএ শূন্য আশা
সে রিদএ স্থান করা নেই
মা এর স্নিগ্ধ ভালবাসা ।

মা হলো গৃহিনী,
মা হলো সহধর্মিনী,
মা হলো একাধারে-
শিশুর কল্যাণ কামিনী ।

যে শিশুকে কষ্ট করে
শূন্য থেকে বড় করে-
তাগ করেন মা তাহার যত সুখ.
কিন্তু সে শিশুই বড় হয়ে

সকল কথা ভুলে গিয়ে
মাকে দেয় অপরিমেয় দুখ ।

চাইনা মোরা এই শিশুকে এই সমাজে রাখতে,
কিন্তু মাযে শিশুর ভুল ধরেনা-
চায় যে কেবলই কাছে রাখতে ।

মাযের শত অবদান নাইকো এর শেষ
তাইত মাকে শ্রদ্ধা জানাতে করবনা কোনো লেশ ।

বই বনাম বই আর মায়ের হাতে মার খাওয়ার স্মৃতি

মনচলি

আমি তখন ক্লাস ফোরে আর ছোটবোন টুকটুকি ওয়ানে। দলবেধে হৈ হুল্লোড় করে স্কুলে যাওয়া আসা করি। বাসা থেকে স্কুল খুব একটা দূরে না। হেটে গেলে দশ/ পনেরো মিনিট সময় লাগে।

যাহোক একদিন স্কুলে আমাদের এক প্রিয় শিক্ষক জানালেন ঈশপের গল্প নামে একটা বই আছে। বইটা যেন সবাই পড়ি। স্কুল শেষে আমরা কয়েক জন বন্ধু মিলে সিদ্বান্ত নিলাম বাসায় না গিয়ে বইয়ের দোকানে যাব। বইটা পাওয়া যায় কি না? পাওয়া গেলে দাম কত ইত্যাদি জানতে যাতে পরের দিন টাকা নিয়ে এসে কিনে ফেলতে পারি। ছোটবোন কে বললাম বাসায় চলে যেতে আর বাসায় গিয়ে মাকে যেন বলে আমরা বই খুঁজতে গেছি। ফিরতে একটু দেরি হবে।

বইয়ের দোকানে গিয়ে দেখি সব বই আছে কিন্তু আমরা যেটা খুঁজছি সেটা নেই। এক দোকান থেকে আরেক দোকনে ঘুরি। ঘুরতে ঘুরতে কোন দিক দিয়ে যে সময় চলে যায় টের পাইনি। বাসায় যখন ফিরি বিকেল ঘনিয়ে তখন প্রায় সন্ধ্যা। গেটের কাছে দেখি মা দাড়িয়ে। চেহারা ফ্যাকাশে। মা কে এরকম কখনো দেখেছি বলে মনে করতে পারিনা।

মা কোন কথা না বলে আমাকে একরকম টেনে ঘরের ভেতর নিয়ে আসেন। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কি হলো মায়ের? ঘরে নিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে ঘরের কোনে লুকিয়ে থাকা বেত বের করে নিয়ে আসেন। আমি পুরো হতভম্ব। একে তো সারাদিনে ক্লান্তি তার উপর মায়ের এমন ভয়ংকর রুপ- সব মিলিয়ে বাকশুন্য হতবুদ্ধি আমি। শুধু বুঝতে পারি মায়ের বেতের বাড়ির ঝড় আমার সারা শরীরের উপর দিয়ে যাচ্ছে। আমি প্রাণপন চেষ্টা করছি টিকে থাকতে। এক সময় আর টিকতে না পেরে জ্ঞান হারাই।

রাতে প্রচন্ড জ্বর আসে। জ্বরের ঘোরে স্বপ্ন দেখি আমি বরফের রাজ্যে চলে গেছি। যে দিকে চোখ যায় শুধু বরফ আর বরফ। বরফের সাদা চাদরে গাছ পালা বাড়ী ঘর সব যেন ঢেকে আছে। তারমাঝে দেখি আমি একটা বাড়ীতে ঘুমিয়ে আছি। ঘুম ভাঙ্গলেই মাথার পাশে দেখতে পাই বিরাট একটা সাদা ভাল্লুক একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি প্রচন্ড পাই। ভয়ে জ্ঞান হারাই। জ্ঞান ফিরলে বুঝতে পারি ভাল্লুকটা কাঁদছে। তার চোখের পানি আমার গালে এসে লাগে। আমি হাত দিয়ে পানি মুছতে যাই আর তখন আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। তাকিয়ে দেখি মা আমার মাথার পাশে বসে আছে। তার দু'চোখে দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা।

শেষ রাতের দিকে জ্বর কমে আসে। মা বললেন তোর জন্য কালোজিরা চাল আর মুগ ডাল দিয়ে নরম করে খিচুরি বানিয়েছি। মা খাবার নিয়ে আসেন। মুখ ধোয়ার জন্য পানি নিয়ে আসেন। আমি কোন আগ্রহ দেখাই না। মা মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন রাগ করিস না। রাতে তেমন কিছু খাসনি। না খেলে শরীর দূর্বল হয়ে যাবে। পড়াশুনায় সমস্যা হবে। তোর বাবা জানলে কষ্ট পাবে।
আমি আস্তে আস্তে বলি,তাহলে তুমি আমাকে ওরকম পাগলের মতো মারলে কেন? মারতে মারতে তুমি তো আমাকে মেরেই ফেলছিলে। আমি কি এমন করেছি যে আমাকে এভাবে মার খেতে হলো?
মা কিছু না বলে আমার দিকে কিছুক্ষন তাকিয়ে থাকেন। তারপর বলেন, ঠিক আছে আর কোন দিন মারব না। এখন খাবারটা খা। ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

আমিও টের পাই ঘুমিয়ে থাকা ক্ষিধার রাক্ষসটা জেগে উঠছে ভয়ানক গর্জন করে। প্রচন্ড ক্ষিধায় পেটের ভিতর দুমড়ে মুচড়ে যেন এক করে ফেলবে। কি করা! খেতে বসি।

খাবার শেষে মা বলেন তোদের বাবা সবাই কে দেশে রেখে একা একা বাইরে পড়ে আছে কার জন্য? কিসের জন্য সে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা উপার্জন করছে? শুধু মাত্র তোদের জন্য। তোদের যাতে কোন অভাব না হয়। তোরা যাতে ঠিক মতো পড়াশুনা করে মানুষের মতো মানুষ হতে পারিস। আর তুই এখন পড়াশুনা বাদ দিয়ে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে সিনেমা দেখে

বেড়াবি- এটা শুনে আমার মাথা কি ঠিক থাকার কথা? তুই বল?

আমি অবাক হয়ে বলি আমি আবার কখন সিনেমা দেখতে গেলাম? আর আমার বন্ধুরা এমন না যে আমাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যাবে।

মা বলেন, কেন টুকটুকি তো বলল যে তুই বলেছিস তোরা কয়েক বন্ধু মিলে বই দেখতে যাবি।
হ্যা- তা বলেছি। কিন্তু সেটা তো ঈশপের গল্পের বই খুঁজতে যাবার কথা।

মা বুঝতে পারেন কোথায় ভুলটা হয়েছে। টুকটুকির মুখে বই দেখার কথা শুনে, বই কে তিনি বই মনে না করে সিনেমা হিসেবে ধরে নিয়ে ভাবছেন আমরা সিনেমা দেখতে গেছি।

হায় খোদা! না বুঝে কি ভুলটাই না করেছি'- অস্ফুট স্বরে মায়ের কণ্ঠ দিয়ে বেড়িয়ে আসে। মা বার বার আফসোস করতে থাকেন। মায়ের জন্য কষ্ট লাগে। আমি জানি মার খেয়ে আমি যত কষ্ট পেয়েছি, আমাকে মেরে মা তারচেয়ে অনেক বেশী কষ্ট পেয়েছেন।

এটাই ছিল মায়ের হাতে আমার শেষ মার খাওয়া। পরে আমি অথবা টুকটুকি দুষ্টামি বা অন্যায় কিছু করলে মা রাগ করতেন, বকাবকি করতেন। কিন্তু কোনদিন আর গায়ে হাত তুলেননি।

আম্মুসোনা

আকাশনীল

আমি মোটামোটি অপদার্থ টাইপের ছেলে। একটা দিন নিজ হাতে বাজার করিনি। কোনদিন রান্না ঘরে চুলো ধরাই নাই। এমনকি এক গ্লাস পানি ঢেলে খেতে আমার বিরাট অনীহা। এহেন অকর্মণ্য ছেলেকে যে ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়নি, এজন্য আমার মাকে মমতাময়ী বললে বহুত কম বলা হয়। মাঝে মধ্যে অবশ্য চরম বিরক্ত হয়ে বলে, তুই আমাকে কবে মুক্তি দিবি বল? এসব কথায় বিশেষ পাত্তা দেই না। সকালে জেগে ওঠা থেকে ঘুমাতে যাওয়া অবধি আম্মুকে জ্বালাই। এবং আমি এমন শয়তানের শয়তান যে মাকে ক্ষেপায়ে মজা পাই।

নিজ হাতে খেতে আমার বড় কষ্ট লাগে। ফাইভ ক্লাস পর্যন্ত খাওয়াদাওয়ার মত ফালতু কাজে হাত লাগাইনি, আম্মু আছে না! হাইস্কুলে ওঠার পর আম্মু নানা টালবাহানা শুরু করল। তখন আমার ছোট ভাইটা হয়েছে। আহা! দশ বছর একলা একলা কত সুখেই না ছিলাম। কি আর করা! কপালের দুর্ভোগ। আম্মুর সাথে অলিখিত চুক্তি হল। একবেলা আম্মু খাওয়ায় দিবে, আরেকবেলা নিজ হাতে খাবো। তিনবার খেলে আম্মু দুবার, আমি একবার। চারবার খেলে দুই দুই সমতা। তারপর দিনকাল ভাল যায়। ক্লাশ নাইনে উঠে আম্মুর মনে হল, ছেলে দামড়া হয়ে গেছে। তাকে আর লাই দেয়া ঠিক না। অনেক চেষ্টা নিলাম, অনশন করলাম, তবু লাভ হলো না। পরীক্ষা আশীর্বাদ হয়ে আসে আমার জন্য। পড়তে পড়তে আমি দিশেহারা, খাবো কখন? মা জননী ও বুঝতে পারে, খাওয়ার চেয়ে পড়া বড়। এই দুর্বলতার সুযোগ কয়েকবার বুয়েটে টার্ম ফাইনালের সময় ও নিয়েছি। আর হাল্কা অসুখ-বিসুখ হলে তো কোনকথা নাই। আম্মু উল্টো আমাকে খাওয়ানোর জন্য জ্বালায়।

খাওয়া-দাওয়া নিয়ে ক্যাচাল এখানে শেষ না, বরং শুরু। খাই অনেক কম কিন্তু ঝামেলা করি শতগুণ। আম্মু প্রতিদিন সকালে আমাকে জিজ্ঞেস করে রান্নার মেনু ঠিক করে। এতকিছুর পরে আমার স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি হয় না। একদম ছোটবেলা থেকে তালপাতার সেপাই। এই নিয়ে আমার যতটা না মাথাব্যথা তার থেকে আমার মায়ের অনেক বেশী কষ্ট। তার জীবনের একটা স্বপ্ন, আমাকে মোটাতাজা দেখে যাওয়া! সারাজীবন শুনেছি, সব সন্তান মায়ের চোখে সমান। কিন্তু আমি ১১০% শিউর আম্মু তার

ছোট ছেলের থেকে আমাকে বেশী ভালোবাসে।

নিতান্ত বাধ্য না হলে আমি এলার্ম ব্যবহার করি না, দরকার হয় না। সেই স্কুলবেলা থেকে এখনকার অফিসবেলা পর্যন্ত প্রতিদিন ভোরবেলা আম্মু ডাকতে ডাকতে অস্থির করে দেয় আর আমি বলি, দশ মিনিট পরে ডাক দিও। তারপর আবার ডাকলে বলি, পাঁচ মিনিট। এভাবে ঘুমাতেই থাকি।

আম্মুর আরেকটি স্বপ্ন, ছেলে বড় হয়ে বিদেশ যাবে। পিএইচডি ডিগ্রীধারী হয়ে বাড়ি-গাড়ি অনেক কিছু করবে। আপাতত আমার মধ্যে এই স্বপ্নপূরণের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। দিব্যি মায়ের কোলে আরামে আছি। অচিন দেশে খামাখা কষ্ট করতে কে যায়? আবার ভাবি, একবার গিয়ে দেখা যাক আমাকে ছেড়ে থাকতে আম্মুর কেমন লাগে! এর কারণ আছে। বুয়েট লাইফে যে কয়েক রাত মাত্র হলে থেকেছি আম্মুর ফোন আসছে, কি করতে থাকবি! চলে আয় বাসায়। মাকে ছেড়ে প্রথম অনেক দূরে যাই অনার্সের দ্বিতীয় বর্ষে। বন্ধুদের সাথে সেন্টমার্টিন্স ট্যুর। আম্মুর অনুমতি পেতে খবর হয়ে গিয়েছিল। গতবছর সিলেট যাবার সবকিছু ঠিকঠাক হলো। হঠাৎ করে আম্মু একটু অসুস্থ। আমি কুলাঙ্গার পুত্র ব্যাগ গুছিয়ে সত্যি চলে গেলাম। তারপর একটা বিভীষিকাময় ট্যুর। আম্মুর অসুস্থতা বাড়তে থাকে আর আমি টেনশনে ছটফট করি। শেষমেষ বন্ধুদের রেখে একদিন আগে চলে আসলাম। আমাকে দেখে আম্মু ক্লান্ত হেসে বলে, মনে করছিলাম তোরে আর দেখতে পাবো না।

এই আমার আম্মুসোনা, আমার সবথেকে আপনজন। আমার জীবনের যা কিছু অর্জন, সব মাকে ঘিরে – সব। জীবনের প্রথম চাকরীর প্রথম মাসের টাকা যখন আম্মুর হাতে তুলে দেই আনন্দে আমার চোখে পানি চলে আসছিল। যাক, আমি একদম অকর্মা না। টুকটাক আর যেসব কর্ম করেছি, যেমন গুটিকয়েক ছাত্রী পড়িয়েছি সেগুলোর কাহিনী আম্মুর সাথে শেয়ার করি। প্রেম-ভালোবাসা এসব তরল বিষয় আমার জীবনে আসেনি। যদি আসে, মাকে জানাবো সবার আগে। কারন, আমার মা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মা। সবশেষে মাকে বলি, মাগো, তুমি আমার আগে যেও নাগো মরে। আমি তোমাকে ছাড়া একটা দিন ও বাঁচতে চাই না।

আমার তুলতুলে একটা অভিমানী "মা"

শ্রাবনসন্ধ্যা

আমার মা। আমার মায়ের কথা মনে হলেই কেন যেন মায়ের নরম তুলতুলে শরীরটার কথা মনে হয়। আমার মা নাদুস নুদুস একটা ছোট্ট মা, কাছে গেলে মনে হয় একটা ফোলানো বেলুনের ভেতর ঢুকে যাচ্ছি, অথবা একটা বেশ করে মাখানো আটার গোলার মধ্যে নাক ডুবাচ্ছি। আমি মায়ের কোলের শিশু,, মানে হোল সব থেকে ছোট সন্তান। সেজন্যই মায়ের সাথে আহ্লাদীপনা করার একছত্র অধিকার আমার। মাকে আদর করে আমি কখনো মা ডাকি, কখনো আম্মু, মামণি, মাদার যখন যা মনে চায়। আমার আম্মু জানে সেটা। আমার একটা প্রিয় কাজ হোল মামণির নরম শীতল শরীরটার ভেতর মুখ ডুবিয়ে জড়িয়ে শুয়ে থাকা। এ আরাম টা বেশীক্ষন কপালে জোটে না, কারণ আমার হিমহিম ঠান্ডা আম্মুটা আমি কাছে গেলেই বলেন ইশ তোমার হাত এত্ত গরম........আমার গা পুড়ে গেল, সরো সরো!!!! মায়ের গা জড়িয়ে তার আর কোন সন্তানরা মাখামাখি করেন না, তাই আমি জানি আমার এই আদরটা মায়ের অনেক পছন্দের.......শুধু ঠান্ডা গরমের জন্য ঘাপলা লাগে।

আমার শৈশব কৈশোর কেটেছে বাবার ছায়ায়, আমার বাবা আমাকে আগলে রাখতেন। মায়ের প্রতি মমতা, কৃতজ্ঞতা অনুভব করতে শুরু করি বয়োঃসন্ধিক্ষনে, যখন থেকে হরমোনগুলো শরীরে অথবা মনে জানিয়ে দিচ্ছিল তুমি মানুষ এবং নারী। তখন থেকেই হয়তো মায়ের সাথে নিজের মিল খোঁজা শুরু। অথবা তখন থেকে মা অনেক কাছের, মায়ের কাছেই সব শেয়ার করা যায় এমন অনুভূতির জন্ম। সেই থেকে খেয়াল করি মা কত কষ্ট করেন। বাবার চেয়ে মা কম শ্রম দেন না এই সংসারটার পেছনে, সন্তানদের পেছনে।

আমার ছোট্ট তুলতুলে মাটা। সেই কৈশোরে বাবার ঘরে এসেছিলেন, গল্প শুনি তাই। এক্কেবারে ঘরকন্যায় আনাড়ী সংসারের বড়বধূ। আমার বাবা কিন্তু অনেক ভালবাসতেন এই বালিকা বধূটিকে। নদীর ঘাটে কলস করে পানি আনার শক্তি ছিল না মায়ের ঐ ছোট্ট শরীরের, শাশুড়ি তো আর মানবেন না সেকথা, বাবা তাই নদীর ঘাট থেকে বাড়ী অবধি লুকিয়ে লুকিয়ে কলসটা এনে মায়ের হাতে ধরিয়ে দিতেন। এসব মায়ের কাছ থেকে শোনা।

আমরা পিচ্চিগুলা যখন পৃথিবীর আলো দেখতাম, তার আগে-পরে এক বছর মা আমার বিছানায় পড়ে থাকতেন, তখন বাবা সামলাতেন শিশু এবং মা দুজনকেই। এগুলোও গল্প। এই হলেন আমার মা। বড্ড নরম, আলসে, ঘুমপ্রিয়.........আমরা এখন বলি মামণিটা শুধু কোয়ালার মতন ঘুমায়। কথা বলবেন এতটাই নিচুস্বরে, মাঝে মাঝে শুনতেই পাই না।

আমাদের ছ' ভাইবোনের বিশাল বাহিনী, এক একজন এক এক বয়সী। বড় গ্রুপ যখন কলেজে যায়, মেজ গ্রুপ তখন হাই স্কুলে, ছোট গ্রুপ শিশু শ্রেণীতে। কাজেই এক এক সময় এক এক জনের বের হওয়া, এবং বাড়ী ফেরা। মা ঠিক সময় মতন সবার জন্য খাবার নিশ্চিত করতেন। কখনো বাইরে বেরুবার আগে অথবা বাড়ী ফিরে খাবার পাইনি এমনটা হয়নি। আর সংসারের কর্তা বাবা তো আছেনই। মা এসব সামলাতেই সারা দিন ব্যস্ত থাকতেন। পাড়ায় অন্য খালাম্মাদের দেখতাম সকাল দশটা এগারোটায় দল বেঁধে এবাড়ী ওবাড়ী আড্ডাদিতেন, এবং অবধারিত বিষয় পরচর্চা। আম্মু কখনো ওসব আড্ডায় যেতেন না। তিনি বলতেন, তাঁর এত সময় নাই। যার ফলে অন্য খালাম্মারও আমাদের বাসায় আসতে মজা পেতেন না।

আমার আম্মু খুব ভাল ভাল রান্নায় পারদর্শী নন, হরেক রকমের আচারও বানাতে পারেন না, আর চা তো আজো বানাতে শিখলেন না। তারপরও হালকা মশলা দেয়া ছোট মাছের ঝোলটা আমার মায়ের চেয়ে ভাল কেউ রাঁধতে পারে না এটা আমি বাজি ধরে বলতে পারি। অল্প মশলায় রান্না যে কত মজা হয় মামনির রান্না না দেখলে বোঝা যাবে না। শ্বশুড়বাড়ীতে যেয়ে সবচেয়ে যেটার অভাব বোধ করেছি সেটা হল আমার মায়ের হাতের আটপৌরে রান্না। মা আমাদের ঘরকন্যার খুঁটিনাটি শেখাতেন। কোন জোর নেই, তিরস্কার নেই, আবার এটাও শেখাতেন কাজ শুধু করলেই হবে না গুছিয়ে করতে হবে, পরিপাটি করে করতে হবে।

আমার মাটা ভীষণ সেকেলে...প্রায় সারা জীবন ঢাকা শহরে পার করে দিয়েও আজ অবধি তিনি একা একা নিউমার্কেট যেতে পারবেন না, জিগাতলা থেকে নিউমার্কেট কি আর এমন কঠিন পথ, কে জানে! শুধু মামার বাড়ীটা তার চেনা, ওখানে একা যেতে পারেন, সেটাও কালে ভদ্রে...মাকে এটা নিয়ে আমরা যে কত ক্ষেপাই।

আমার মা খুব লেখাপড়া শেখেননি। তবে গল্প শুনি তিনি অনেক মেধাবী ছিলেন, বাবা ও সায় দিতেন। ক্লাশ সিক্সএ পড়ার সময় তিনি ক্লাশ টেন এর ছেলেদের অংক সমাধান করে দিতেন। এত মেধাবী একটা মেয়েকে আমার নানা পড়াশোনা না করিয়ে কেন বিয়ে দিলেন, আর বাবাও বা কেন পড়ালেন না। এজন্য দুজনের উপরই সেই ছোটবেলাতেই খুব রাগ হোত। আমি মনে মনে ভাবতাম, মামণি যদি পড়াশোনাটা আরেকটু করতেন তাহলে হয়তো মামার মতন একটা বড় অফিসার হতেন। আর এরপরই কি আফসোস আমার, সবই মনে মনে। মাঝে মাঝে মামণিকে বলতামও সেকথা, মামণি দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন, বলতেন- হুম তাই তো!

যখন প্রথম বাড়ী ছেড়ে হলে যাই। নাচতে নাচতে গেছিলাম। ওখানে খুব হোমসিক ও লাগেনি। তবে যেদিন প্রথম বাড়ী এলাম, মা দরজা খুললেন, বাসায় পা দিয়েই...কি যে হল! মাকে জড়িয়ে সেকি কান্না আমার! মা পরে সবাইকে ফিস ফিস করে বলে বেড়ালেন সে কথা। আমি নিজেও তখন ভাবলাম...আসলে কি আমি মাকে এত্ত ভালবাসি!

হল থেকে ফিরলে, এতদিন বাড়ীতে যা কিছু খাওয়া হয়েছে তার সবকিছু থেকে আমার জন্য তুলে রাখা অংশগুলো রান্না হোত। ছোট্ট ছোট্ট প্যাকেট। মাছ, মাংস, ফল, আচার কি নেই! আলাদা রান্না হোত এবং আমাকে আলাদা খেতে হোত। আব্বা খুব চাইতেন আমি তাঁর সাথে খাই। মা দিতেন না। নানা ছুতো করে আমার খাওয়াটা পিছিয়ে দিতেন। এই ব্যপারটা ঘটতো তাঁর সব সন্তানদের বেলাতেই। আগে বুঝতাম না। যখন বড়পা বাড়ীতে ছিলেন না, তখন তার জন্য খাবার তোলা থাকতো, মেজ ভাই একবার দেশের বাইরে থেকে ফিরবেন, শুরু হোল তার জন্য খাবার গোছানো। তখন সে কি হিংসা করতাম। মনে হোত আম্মুটা শুধু ওদের ভালবাসে। পরে নিজের বেলাতে এসে বুঝলাম, আম্মুটা কোন সন্তানকে ফেলেই কিছু খেতে পারেন না। সব সন্তানের প্রতি তার সমান খেয়াল। সবার দুঃসময়ে তিনি নিরব শ্রোতা এবং ভারলাঘবকারী। আমার তো মনে হয় আমরা প্রত্যেকটা ভাইবোন ভাবি মা আমাকেই বেশি ভালবাসেন। আমার কষ্ট হচ্ছে...এটা মাকে বলতে হবে। আর মা যে কি রকম অন্তর্যামী, চোখ দেখলেই বুঝে ফেলেন কিছু হয়েছে। কিচ্ছু বলবেন না। মোক্ষম সময়ে কাছে এসে কথাটা আদায় করে নিয়ে যাবেন।

এই হল আমার মা। এখন বেশ অভিমানী কিশোরীর মতন হয়েছেন। তার সমস্ত গল্প সময় করে শুনে আসতে হয়। সংসারের সব খুঁটিনাটি, পুত্রবধূদের সাথে মান অভিমান, আব্বাকে নিয়ে নানান অনুযোগ। একদিন রাগ করে বললাম, আমাকে এসব কেন বল? অভিমানে কেঁদেই দিলেন। বললেন, তোমরা মেয়েরা যদি একটু না শোনো আমি আর কাকে বলবো! আমি তো কাউকে কিছু বলিনা। সমাধান ও করতে বলিনা। শুধু তোমাকে বলে একটু হাল্কা হচ্ছি। তখন টনক নড়লো...হায় হায় সারাজীবন মাকে তুচ্ছ সব ঘটনা না বললে পেটের ভাত হজম হোতনা। এখন যে আমার মাটা সেই রকম হয়ে গেছে। তখন চোখের পানি মুছিয়ে হেসে বলি...আচ্ছা ঠিকাছে বল, এবার শুনি।

একদিন আমার সদ্যজাত শিশুকন্যা জাফনা, তারপাশে আমি, আমার পাশে আম্মু...শুয়ে আছিআম্মু বললেন কি অদ্ভুদ দৃশ্য। আমার এই মেয়েটা সেদিন জন্মালো আর আজ আমি তার মেয়েকে পাশে নিয়ে আছি!!!!! আমি ভাবলাম আম্মু কি আমার জন্মদৃশ্য কিংবা সেই সময়কার ঘটনাগুলো ভাবছেন? আমি ভাবি এখন আমরা একটা অন্যরকম এবং অসাধারন সময়ের মুখোমুখি। তিন প্রজন্মের তিন নারী পাশাপাশি। কি এক অপূর্বক্ষণ!!!

সৃষ্টিকর্তার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা আমার নরম নরম মা অনেক ভাল আছেন। নিরোগ, নিশ্চিন্ত, সুখী।

যে কথা মাকে বলিনি...

মতিউর রহমান সাগর

● জোনাক দেখে আমার বিস্ময়, তুমি তাই পরিয়ে দিলে জোনাকমালা । বুকপকেটে জোনাক নিয়ে আমার এখন দিন কেটে যায়, রাত কেটে যায়।

● ● বহুদিন ধরে গোপনে জমিয়ে রেখেছি সংগোপন স্বপ্ন এক। তোমার অশ্রুবিন্দু জমাবো কৌটোয় সযতনে। আমার জমজম নেই , গঙ্গাস্নান নেই। আমার আবেহায়াত মানে তোমার স্নেহজল।

● ● ● কাঁটাগাছ সব তুমি একা বুকে নিলে । সব হিজলের ফুল তুলে আমার বুকে জমালে ফাগুন। ফাগুনে আমার ডুবসাঁতার দেখে তাও তোমার অকারণ শংকা এখন। কি যে করি, তোমাকে নিয়ে কি যে করি?

● ● ● ● গুনগুনিয়ে উঠা আমি তোমার কোলে শুয়ে শিখেছিলাম, সে কথা জানাতেই দুটো শালিখ তোমার ছানা হতে চায়; নিয়ে আসি ঘরে? আমি হাতপা ছড়িয়ে শুলেওতো তোমার কোল জুড়ে এক ব-দ্বীপ দিব্যি শুতে পারে।

• • • • • তুমি জানোনা, তোমার আঁচল কেটে রাখা আমার গোপন সিন্ধুকে। খুব পিপাসায় আকন্ঠ সে ছায়ায় ঘুমিয়েছি কত দুপুর। আমার কেবলি তৃষ্ণা বেড়ে যায়।

• • • • • • না তোমার ছবি আঁকিনা । রংয়ে প্যাপিরাসে তুলিতে তোমার মুখ যে কোন মানুষীর মতো , একথা ভাবতেই প্যাস্টেল উল্টে ফেলে দেই।

• • • • • • • প্রগলভতা দেখে খুব হাসবে, জানি, খুব হাসবে। বলবে, দূর বোকা। আচ্ছা যাও । আমি বোকা। এখন বলো, আর জন্মে আমার খোকা হবে তুমি , দ্যাখো ,পারি কিনা বাসতে অমন। ইস্! তুমি যেন একাই পারো ।।

যে চিঠি কখনো পৌছুবে না

ইলা মুৎসুদ্দী

মা,

তুমি কেমন আছো? ঐ দূর আকাশের নীলিমায় তারা হয়ে কিভাবে আছো মা? তোমার কি কখনো ভুলেও মনে পড়ে না তোমার অসহায় ছেলে-মেয়েদের কথা? যাদের তুমি সবসময় বুকে আগলে রেখেছিলে শত সহস্র ঝড় ঝাপটা সয়ে। কখনো একটুখানি আচড় লাগতে দাওনি কারো গায়ে। মা তুমি তো ছিলে গ্রাম্য এক গৃহবধূ। যাঁকে গাইড করার মতো একজন কেউ ছিল না। সবসময় দেখতাম তুমিই বাবাকে গাইড করতে। সবকিছু এত সুন্দরভাবে ম্যানেজ করতে সবাই তোমার প্রশংসায় ছিল পঞ্চমুখ। তোমার সবচাইতে বেশী পছন্দ ছিল মানুষকে খাওয়ানো। তোমার পিঠা বানানোর কথা তোমার মৃত্যুর দিন শবানুষ্ঠানে সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেছে। তোমার উদার দানশীল মন মানসিকতার জন্য সবাই তোমাকে খুউব পছন্দ করতো। গ্রামবাসী সবাই কোন সমস্যায় পড়লে আগে তোমার কাছে ছুটে যেত। সেটা কোন অসুখ হোক কিংবা কোনকিছু ধার দেনা হোক। জানো মা, তুমি চলে যাওয়ার পর সবাই প্রতিদিন, প্রতি ক্ষণ তোমাকে, তোমার সুকর্মগুলোকে স্মরণ করে। যখনি গ্রামে যাই, সবার কাছে শুধু তোমার প্রশংসা শুনি। তখন গর্বে আমাদের বুক ভরে যায়। তোমার মত মায়ের গর্ভে জন্মেছি সেও নিশ্চয়ই কোন সুকর্মের প্রভাবে। আচ্ছা মা তুমি কি দেখতে পাও তোমার সন্তানদরে? তোমাকে ছাড়া আমাদের কি অসীম দুঃখ, বেদনা হাহাকার তা তুমি বোঝ না? কেন তুমি আমাদের মাঝে আবার চলে আস না? তুমি যখন আমাদের কাছে ছিলে তখন আমরা এই কষ্টটা কখনো বুঝিনি। কখনো ভাবিনি এত তাড়াতাড়ি তোমাকে হারাতে হবে। জানো মা সন্তানদের কাছে সবচাইতে কষ্টের জিনিস কি? তা-হলো অসময়ে মা-কে হারানো। তুমি সবসময় বাবার কথা চিন্তা করতে। অথচ তুমিই বাবাকে একা ফেলে আগে চলে গেলে। যদি তোমার যাওয়ার সময় হতো তাহলে আমরা মেনে নিতাম। এখনতো মনকে কোনভাবেই বুঝাতে পারি না। তুমিহীনা সেই ঘরে আর যেতে ইচ্ছে করে না। আমরা কেউ বাড়িতে যাচ্ছি শুনলে, আগেই পথের সামনে দৌড়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকতে। আর আমাদের দেখে উচ্ছসিত হয়ে বুকে জড়িয়ে ধরতে। এখনতো কেউ আসে না। সবসময় তোমার জন্য প্রাণ কাঁদে।

একা একা কান্না করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আগে তুমি ছিলে। তোমাকে সব কথা বলতাম। এখন কাকে বলব মা? সবার বড় সন্তান হওয়াতে আমাকে বেশী আদর করতে। বিয়ে হওয়ার পর থেকেই একমাত্র আমিই তোমাকে না দেখে থাকতে পারতাম না বলেই প্রায় প্রতি সপ্তাহে তোমাকে দেখতে যেতাম। এক সপ্তাহ দেরী করলে তোমার ভিতর ছটফটানি শুরু হতো। সাথে সাথে আমার ভিতরও একধরনের হাহাকার শুরু হতো। যখনি আবার তোমার সামনে যেতাম, সবকিছু ঠিক হয়ে যেতো। এখন শত হাহাকারে বুক ভেঙ্গে গেলেও তোমাকে দেখার উপায় নেই। মা- তুমি তো বলতে তোমাকে অমুক বলেছে, তোমার মেয়ের লিখা উঠেছে পত্রিকায়। তুমি কত খুশি হয়ে আমাকে বলতে। আজ তোমাকে নিয়ে লিখছি মা--- তুমি কি খুশি হয়েছো মা? কেন আমাকে আজ লিখার কাঠগড়ায় দাঁড় করালে? আমরা চার ভাইবোনকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে তুমি চলে গেলে। মা জানো টুটু খুব দুঃখের সাথে বলেছে, আজ যদি আমাদেরকে লেখাপড়া না শিখিয়ে বকলম বানিয়ে রাখতে তাহলে তোমার চলে যাওয়ার সময় আমরা ভাইবোনেরা হয়তো তোমার পাশে থাকতাম। আমরা তোমার এমন দুর্ভাগা সন্তান চলে যাওয়ার সময় একটা সন্তানের মুখও দেখে যেতে পারোনি। তারপরও তুমি অনেক পূণ্যবান মা। কাউকে একটুও কষ্ট না দিয়ে মিনিটের মধ্যেই সবকিছু শেষ করে দিয়ে চলে গেলে। বাবাও বুঝতে পারেনি মা তুমি যে চলে গেছ। তোমার জন্য বাবা এলোপাতাড়ি দৌড়ে গিয়ে ডাক্তার ডেকে এনেছে। তখন তো সব শেষ মা। আগের সপ্তাহে তোমার সাথে দেখা করে এসেছি। সেই দেখা যে শেষ দেখা হবে বুঝতে পারিনি মা। তুমি আমার জন্য পিঠা বানিয়ে রেখেছিলে। আমাকে আদর করে ভাত খাইয়েছ। আবার আমার ব্যাগ হাতে নিয়ে আমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়েছ। জানো মা, সেদিন তোমাকে দেখে আসার পর থেকে আমার মনে একটা দাগ কেটে গিয়েছিল। আমার থেকে সবসময় মনে হয়েছে তোমার মুখখানি খুব ফ্যাকাসে সাদা হয়ে গেছে। বুঝতে পারিনি মা, চলে যাবে বলে মনের ভিতরে গভীর বেদনার ছাপ পড়েছিল। মা তোমার বিহনে আমার খুউব খুউব কষ্ট মা। জানো মা, তুমি চলে যাওয়ার ছয় মাস হয়নি, বাবুল কাকাও তোমার মত হঠাৎ করে চলে গেছে খুব অসময়ে। কেন এমন হলো মা? টুই, জুঁই-কে কি বলে সান্তনা দেব মা? তুমি বেঁচে থাকলে খুব কষ্ট পেতে মা। কাকীমার মুখের দিকে তাকানো যায় না। কষ্টে বুক ভেঙ্গে যায়। সবশেষে বলি মা ---- আমাদের আশীর্বাদ করো মা আর যেখানেই থাকো ভালো থেকো।

মাতৃত্ব ও স্বার্থপরতা

বাবুল হোসেইন

আমার তৃষ্ণা পেলে তুমি টের পাও
অথচ আমি বুঝিনা কখন তুমি ক্ষুধার্ত
আমার রাগ হলে তুমি নরম পরশ দাও
অথচ আমি বুঝিনা তুমি রেগেছো কিনা
আমার খারাপ সময়ে তুমি প্রার্থনায় নতজানু
অথচ তোমার অসুখে আমি দিব্যি থাকি
আমার সুখ সংবাদে তুমি পুলকিত
অথচ আমি বুঝিইনা কখন তুমি সুখী।

এই বুঝার নাম মাতৃত্ব
এই না বুঝার নাম স্বার্থপরতা।

(মাকে নিয়ে ভেবে ভেবে কি লিখব না পেয়ে অবশেষে লিখে ফেললাম খুবই মানহীন একটা লিখা। হঠাৎ এক সকালে আবিষ্কার করি আমি মাকে অনেক অবহেলা করি। ভাবলাম এর কিছুটা অন্তত লাঘব হোক। তাই এই ছোট্ট আয়োজন। আশা করি ভালো লাগবে।)

প্রাপক, আমার মা

অগ্নিলা

আম্মু,

এটা লুকিয়ে লেখা একটা চিঠি। কোনদিন এটা তোমার পর্যন্ত পৌছাবে না। যেমন আটপৌরে চলা ফেরায় কখনো তোমাকে বলা হবে না তুমি ছাড়া আমি কি রকম অচল।

আজকে সকালে আমার উচিৎ হয়নি তোমার সাথে এভাবে কথা বলা। আমার পরীক্ষা বলে তুমি কষ্ট করে এত সকালে ঘুম থেকে উঠেছিলে, তুমি জানো আমার টেনশনে খাবার বন্ধ হয়ে গিয়েছে তাই তুমি জোর করছিলে। আমিই অনেক পচা হয়ে গিয়েছি। আমি থেমে বলতে পারতাম আম্মু আমি খেতে পারছি না অথবা তোমার কথা মেনে ১টা রুটি খেয়ে নিলে এমন কিছু ক্ষতিও হত না। লেভেল-১ এ থাকতে যখন হলে থাকতাম তুমি এতটা পথ পার হয়ে প্রতিটা পরীক্ষার সকালে আমার জন্য খাবার নিয়ে যেতে। খাবার না, তোমার মুখটা দেখার জন্য আমি বসে থাকতাম।

তোমার কত কষ্ট হত কোন তুমি সেটা নিয়ে অভিযোগ করনি, তোমার অভিযোগ ছিল এমন কি আহামরি পড়া যে বাসায় বসে পড়া যায় না, হলে থাকতে হয়? আমি তোমার কথায় খুব বিরক্ত হতাম। কখনও ভাবিনি আমার মুখ না দেখে থাকতেও তোমার একই কষ্ট হয়।

আমার বকা শুনে তুমি যখন মুখ ঘুরিয়ে নিলে তখনও দৌড়ে তোমাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরতে পারতাম। বলতে পারতাম তোমার ভালবাসায় আমার রাত জাগার কষ্ট চলে গেছে এখন খাব সত্যি। বলা হয় না, ক্লাসে তাড়ায় ভার্সিটি চলে আসি। পরীক্ষার টেনশনে তোমাকে ভুলে যাই। কিন্তু তুমি ভুল না। পরীক্ষার হল থেকে বের হলে তোমার ফোন পাই।

উৎকন্ঠা মাখা গলায় জানতে চাও খাওয়া হয়েছে কি না। আমি তখনও বলতে জিজ্ঞেস করতে ভুলে যাই তোমার খাওয়া হয়েছে কি না। তুমি কি অষুধ খেয়েছ? শুধু হাউমাউ করে বলি পরীক্ষা ভাল হয় নাই।

আম্মু তোমার মনে আছে আমি যেদিন জন্মালাম সেদিন তোমার অথবা আমার মারা যাবার কথা ছিল? কি দুর্যোগের রাত ছিল সেটা!!! তুমি কি সেই রাতের কথা মনে করে আমার সব অপরাধ মাফ করে দাও? তবে কেন আমি সেই রাতে কথা ভেবে অপরাধগুলো করা থেকে বিরত থাকতে পারি না?

বিকালে বাসায় ফিরে আসি। তোমার চোখে শুকনা অশ্রুর দাগ। বড় মেয়ের জন্য চোখের পানি ফেলতে ফেলতে রান্না করছ, ঘর গুছিয়েছ। ছোট মেয়েকে স্কুলে দিয়ে এসেছ আবার নিয়ে এসেছ। তুমি কিভাবে এতটা কর মা? আমি কেন পারি না? পরশু তোমার মত করে পায়েশ রান্না করতে চেয়েছিলাম, কিছুতেই তোমার মত হল না। তোমাকে বলায় তুমি হেসে বললে আমার চেয়ে মজা হয়েছে। আপুর বিয়ের সময় তুমি আপুর পাশে গিয়ে বসছিলে না। আপু ভাবছিল তুমি ওর সাথে রাগ করেছ। কি হত মা যদি লুকিয়ে না কেঁদে ওর গলা ধরে কাঁদতে, আর বলতে ও চলে গেলে তোমার অনেক কষ্ট হবে? কেন নিজের দুর্বলতা দেখিয়ে আমাদের দুর্বলতাগুলো বাড়াতে চাও না? মা, আমরা কি পারি না তোমার দুঃখ গুলি নিতে?

কি দিব মা তোমাকে? আমার যদি পাখা থাকত তবে তোমাকে উড়িয়ে আপুর কাছে নিয়ে যেতাম। তোমার সারাদিন কাটে আপুর চিন্তায়। সেখানে গিয়েও কি তুমি স্বস্তি পাবে? আমার জন্য, আব্বুর জন্য, বাবুর জন্য একইভাবে অস্থির হবে। গত বছর এক জোড়া পাথর বসানো রূপার দুল দিয়েছিলাম সব কিছুর সাথেই ওইটা তোমার পরা চাইই চাই। মুখিয়ে থাক বলার জন্য এটা আমার মেজো মেয়ে গত মা দিবসে দিয়েছে। আম্মু, জিনিষটা খুব কম দামি তবু তোমার ভালবাসা দিয়ে কেমন দামী করে ফেললে। আমি কি পারব তোমার মত ভাল মা হতে? জানি তুমি শুনলে বলবে আমার চেয়েও ভাল হবে।

আম্মু, আমি তোমার চেয়ে ভাল হতে চাই না। শুধু তোমার মত মা হতে চাই। ঠিক তোমার মত।

আম্মার কথা

অদিতি

আমার আম্মা ছোটবেলায় অসম্ভব দুষ্ট ছিল। ঐ সময়ের কয়েকটা গল্প আমাদের বলেছে, সেগুলো আপনাদের বলি -

আমার নানা বাড়ি বরিশাল (দাদা বাড়িও)। আম্মা পড়ত বরিশাল সরকারী গার্লস স্কুলে। সেই স্কুলে কংকাল ছিল একটা রুমে। আম্মাদের বান্ধবী নীনা (খালা) খুব ভীতু ছিলেন, আম্মার নেতৃত্বে কয়েকজন ঠিক করল তাঁকে ভয় দেখাবে। স্কুলে বিস্কুট খেতে দেয়া হত, সেই বিস্কুট একটা ঐ কংকালের দাঁতের ফাঁকে রাখা হল। আম্মা সেলাই ক্লাসের সুতা থেকে খানিকটা আগে থেকে রেখে দিয়েছিল। সুতাটা কঙ্কালের হাতের সাথে বেঁধে এমন ভাবে সেট করা হল, যেন সামান্য টান দিলেই ওটার চোয়াল নড়ে। টিফিনের সময় বাকীরা নীনা খালাকে নিয়ে এল, তারপর নীনা খালা তো অজ্ঞান হয়ে গেল কঙ্কালের বিস্কুট খাওয়া দেখে। ঘটনাটা কিভাবে যেন ছড়িয়ে পড়েছিল। হেডমিস্ট্রেস শাস্তি দেবার ভয় দেখিয়েও কারো কাছ থেকে আদায় করতে পারেননি কাজটা কার। আম্মার ভয়ে কেউ মুখ খোলেনি।

আম্মাদের স্কুলে একটা নারকেল গাছ ছিল। আম্মা একবার ওটাতে উঠে নারকেল পাড়ছে, এমন সময় এক স্যার এসে হুমকি ধমকি দেইয়া শুরু করল। আম্মার মতলবে স্যারের হাতে দুটো নারকেল দেয়া হল। আর তারপরই আম্মা গাছ থেকে দে দৌড়! স্যার তার পিছু নিতে পারেননি দুই হাতে নারকেল আর ধুতি সামলে। আর আম্মার যন্ত্রণায় মৌলভী সাহেব স্কুল থেকে বদলী নেন।

আম্মা, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। ক্লাসে তার নির্দিষ্ট জায়গায় একবার এন এস এফের এক গুন্ডা খাতা রেখেছিল, আম্মা ঐ খাতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল মাটিতে।

আর কোন গল্প মনে আসছে না এই মুহূর্তে, মনে পড়লে বলব আপনাদের।

মা - ছোট্ট শিশুর প্রথম ভালবাসা। নিরাপত্তা আর মমতায় গড়া সেই কোল, সেই উষ্ণতার পরশে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে চায় মন। বড় হয়ে ওঠার সাথে সাথে মা'কে ঘিরে জমা হয় ভালবাসা, অভিমান আর দুষ্টুমির শত শত গল্প। সঙ্কটকালে কেবলই মনে হয় যদি সব কিছু ছেড়ে মা'র স্নেহমাখা কোলে মুখ লুকাতে পারতাম, তবে পৃথিবীর কোন কষ্টই আমাকে স্পর্ষ করতে পারতোনা। দৃশ্যত মা কারও কাছে থাকেন, কারও বা দূরে - কিন্তু মা আছেন সবার হৃদয়ে - সব সময়। মা'কে নিয়ে লিখতে গেলেই মনে পড়ে যায় সেই ছেলেটির কথা, যে প্রিয়তমাকে উপহার দেবে বলে মা'র হৃৎপিন্ডটা ছিড়ে নিয়ে যাচ্ছিলো, পথে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে মা'র হৃৎপিন্ড বলে ওঠে - "বাবা, ব্যাথা পেলি?"

৯ই মে ২০১০, মা দিবস উপলক্ষে সামহয়ারইন ব্লগের ব্লগারদের লেখা নিয়ে প্রকাশিত হলো ই-বুক "মমতাময়ী"। মা'কে নিয়ে লেখা বারটি রচনা স্থান পেয়েছে এই সংকলনে। সংকলনে অন্তর্ভুক্ত সবকয়টি লেখার পরতে পরতে উঠে এসেছে মা-র জন্য ভালবাসা ও আবেগের উচ্ছাস। লেখা আহবানের দিন থেকে ৮ই মে ২০১০ তারিখ পর্যন্ত পাওয়া সব কয়টি লেখাই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সংকলনে।

সংকলনটি তৈরীতে আমাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছে ব্লগার Kisuna ও ব্লগার বাবুনি সুপ্তি। সংকলনের পরিকল্পনা গ্রহনের সময় থেকে সংকলনটি প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে সার্বিক সহায়তা দিয়েছেন যারা, আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা তাদের প্রতি। কৃতজ্ঞতা সামহয়ারইন ব্লগের সবার প্রতি - আমাদের সাথে থাকার জন্য।

সবাইকে ধন্যবাদ।

~স্বপ্নজয়~
০৯/০৫/২০১০